প্রথম আলো

তারিখ ...2 4 MAY 2009...
পৃষ্ঠা ...

সময়ের প্রেক্ষিত ■ মনজুরুল হক

ছাত্ররাজনীতি : দেশ ও বিদেশের অভিজ্ঞতা

ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে আমার নিজের সম্পর্ক বলা যায় অনেকটা যেন রক্তের। ষাটের দশকের শেষ দিকে আমাদের ইতিহাসের এক উত্তাল সময়ে ছাত্ররাজনীতি যখন ছিল জনতার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত, ছাত্ররাজনীতিতে আমার নিজের হাতেখড়িও অনেকটা সেই সময়ে। ছাত্ররাজনীতিতে জড়িত হওয়ার সুবাদে বিশ্ব রাজনীতির সঙ্গেও আমাদের তখন গড়ে উঠেছিল নিবিড় একধরনের সম্পৃক্ততা। পরে ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কের সূত্র ধরে মুক্তিযুদ্ধে আমার অংশ নেওয়া এবং সেই সূত্রে রক্তের সম্পর্ককে আরও অনেকটা পাকাপোক্ত করে নেওয়া।

ল্যাবরেটরি স্কুলের কঠোর শৃঙ্খলার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আক্ষরিক অর্থে অনেকটা বলা যায় দেয়াল ডিঙিয়ে প্রতিবেশী ঢাকা কলেজে পদার্পণের শুরুর দিনগুলোতে যাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছাত্ররাজনীতিতে আমাদের কয়েক বন্ধুর অনুপ্রবেশ, তিনি ছিলেন সেই সময়ের ঢাকা কলেজের প্রতিভাবান তরুণ নিজামউদ্দিন আজাদ। এটাকে ভাগ্যের পরিহাস বলতে হয় যে বেতিয়ারার যুদ্ধের বীর শহীদ নিজামউদ্দিন আজাদ নিজের রক্তের বন্ধনে আমাদের কয়েক বন্ধুকে সেদিন আরও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত করে দিয়েছিলেন ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে। আমাদের ঢাকা কলেজের সেই দিনগুলোতে আরও একজন আজাদের সংস্পর্শে আমরা আসতে পেরেছিলাম, ১৯৭০ সালের কলেজ সংসদ নির্বাচনে যিনি ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন সহসভাপতি পদের জন্য, সাধারণ সম্পাদক পদে যাঁর সাথি ছিলেন খান মোহাম্মদ ফারাবী। দুজনই এখন প্রয়াত। আমাদের সেই বয়োজ্যেষ্ঠ আজাদ ভাইকেও আমরা হারিয়েছি আমাদের মুক্তির যুদ্ধে, আর যুদ্ধের পর ফারাবী অকালে চলে গেছেন মরণব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে। ফলে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে আমাদের সম্পৃক্ততা হয়ে ওঠে আরও অনেক গভীর।

মনে পড়ে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম যে স্লোগান ছাত্ররাজনীতিতে জড়িত আমাদের অনেককে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল, সেটা হলো 'এসো দেশ গড়ি'। সম্ভবত শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী এই স্লোগান নিয়ে এঁকেছিলেন চমৎকার এক পোস্টার, যেটা আমরা গর্বের সঙ্গে সেঁটে দিয়েছিলাম ঢাকা শহরের অনেক দেয়ালে। স্বাধীনতার পর শুরু হওয়া আমাদের রাজনীতির নতুন পরিবেশে আমরাও নতুন চিন্তায় আপ্লুত ছিলাম এবং সেই সূত্রে ফারাবীর সঙ্গে আমি নিজেও যুক্ত হয়েছিলাম স্বাধীন বাংলাদেশে ছাত্র ইউনিয়নের প্রথম সাপ্তাহিক মুখপত্র *জয়ধ্বনি* প্রকাশে। বর্তমানে নিউইয়র্ক প্রবাসী আমাদের আরেক বন্ধু হাসান ফেরদৌসও তাঁর স্বভাবসুলভ উৎসাহ বোধ নিয়ে যুক্ত হয়েছিল এর সঙ্গে। *জয়ধ্বনি* নামটিও এসেছিল স্বাধীনতার বছরখানেক আগে ফারাবীর দেওয়া একুশের একটি সংকলনের নামকরণ থেকে। দেশ তখন পরাধীন থেকে গেলেও আমরা কিন্তু অজান্তেই ছড়িয়ে দিয়েছিলাম স্বাধীনতার জয়ধ্বনি।

আমার ব্যক্তিগত জীবনে এর পরের ইতিহাসের বিস্তৃত সময় জুড়ে রয়েছে প্রবাসে বসবাসের ইতিহাস। ফলে ছাত্ররাজনীতির কলুষিত যে অধ্যায়ের সূচনা, অনেকটা বলা যায়, বর্তমানের এক জাগণা নেতার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক ছাত্রকে হত্যায় জড়িত থাকার মধ্য দিয়ে, এর কোনোটাই কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হয়নি। তবে দেশের ওপর দূর থেকে চোখ রেখে যাওয়ায় এর আরও পরে সামরিক শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় ছাত্ররাজনীতির ভিন্নপথে অগ্রসর হওয়া এবং সেই সূত্রে টেন্ডারবাজি ও তদবির রাজনীতিতে একধরনের ছাত্রনেতার ভিড়ে যাওয়ার কোনোটাই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। আমরা দূর থেকে দেখেছি সমাজের সামগ্রিক স্খলনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের একসময়ের অগ্রসর ছাত্রসমাজের একটা অংশও কিভাবে তলিয়ে গেছে নৈতিকতাহীন এমন এক অন্ধকার জগতে, যার মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে নগদ অর্থ, কোনো রকম আদর্শবোধ নয়। সমাজের সার্বিক সেই অবক্ষয়ে ব্যথিত বোধ করা ছাড়া অন্য কোনো কিছু করার পথ প্রবাসজীবনে তেমন একটা ছিল না। ফলে একধরনের বেদনার বোধ নিয়েই আমরা চালিয়ে গেছি আমাদের লেখাপড়া এবং পাঠের গতি শেষ করে পরে প্রবেশ করেছি কর্মজীবনে।

বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতির নামে যা চলছে, এর সবটাই উচ্ছৃঙ্খলতা —ফাইল ছবি

আমাদের মতো একই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে প্রজন্মকে যেতে হয়েছে, সেই প্রজন্ম অবশ্য সংগত কারণেই এখন মনে করতে পারে দেশের ভেতরের এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সার্বিক পরিবর্তনের আলোকে পুরোনো কাঠামোর সেই ছাত্ররাজনীতির আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কি না। আমার প্রবাসজীবনের ভিন্ন তিনটি অধ্যায়ে ভিন্ন যে তিনটি দেশে জীবনের বেশ বড় একটা সময় আমার কেটেছে, সেই দেশ তিনটি হচ্ছে আমাদের সময়ের সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও জাপান। তিনটি দেশই বিশ্বের অগ্রসর রাষ্ট্রগুলোর পর্যায়ভুক্ত। তিনটি দেশের কোথাও ছাত্ররাজনীতির এতটা লাগামহীন আচরণ আমার চোখে পড়েনি, যেমনটা আমরা দেখে আসছি বাংলাদেশে প্রায় দু-তিন দশক ধরে। তিনটি দেশের মধ্যে, প্রথম দুটি দেশের ছাত্রসমাজ অবশ্যই রাজনীতি সচেতন এবং সেই রাজনৈতিক সচেতনতা বিভিন্ন আন্দোলনে সম্পৃক্ত হতে তাদের উৎসাহিত করে। জাপান অবশ্য সেদিক থেকে অনেকটাই ব্যতিক্রমী।

রাজনীতি থেকে নিজেদের স্বেচ্ছায় দূরে সরিয়ে রাখায় জাপানের ছাত্রসমাজের মধ্যে রাজপথের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা মোটেও দেখা যায় না; যদিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি নিয়ে ক্যাম্পাসের ভেতরে সভা-সমিতিতে মিলিত হওয়া কিংবা পোস্টার আঁকায় তারা পিছিয়ে নেই। ইরাক যুদ্ধের সূচনালগ্নে ইয়োকোহামা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কঠিন এক রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরা একটি পোস্টার আমার চোখে পড়েছিল, জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুনিচিরো কোইজুমিকে যেখানে দেখা গেছে একটি উটের সাজে শুকনো মরুভূমির ওপর হেঁটে যেতে, যে উটের গলায় বেঁধে রাখা রশিটি ছিল বুশ সাহেবের হাতে ধরা। ছাত্ররাই বিশাল আকারের সেই পোস্টার এঁকে সেটা সেঁটে দিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ার কাছের উন্মুক্ত খোলা চত্বরে। ফলে তাদের যুদ্ধবিরোধী বক্তব্য অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হয়নি মিছিল করে স্লোগান দিয়ে বেড়ানোর।

বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতির নামে সাম্প্রতিক সময়ে যা চলছে, এর সবটাই বলা যায় একধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা। ছাত্ররাজনীতির নেতারা, বিশেষ করে বিভিন্ন সময়ের ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছাত্ররাজনীতির নেতারা রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হচ্ছে নিজের পার্থিব চাওয়া-পাওয়ার তাৎক্ষণিক হিসাব-নিকাশের আলোকে। ফলে ছাত্রজীবনের মূল যে উদ্দেশ্য, সেই লেখাপড়ার সঙ্গে তাদের তৈরি হচ্ছে যোজন দূরত্ব। পাঠক, একবার ভেবে দেখুন লালবাগের একসময়ের সেই সাংসদের কথা, দীর্ঘ সময় ধরে বিশেষ একটি প্রভাবশালী ছাত্রদলের যে ছিল সভাপতি। বেশ কিছুদিন আগে *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত এক রিপোর্টে সেই ছাত্রদলটির বর্তমান নেতৃত্বের বয়সের যে হিসাব তুলে ধরা হয়েছিল, তা কিন্তু রীতিমতো আমাদের শঙ্কায় ফেলে দেয়। আমাদের কাছাকাছি প্রজন্মের কোনো কোনো প্রতিনিধি এখনো পর্যন্ত কীভাবে ছাত্র থেকে যেতে পারে, সেই হিসাব আমরা কিছুতেই মেলাতে পারি না।

২

জাপানে আমার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা এক যুগের বেশি। ফলে বলা যায়, ছাত্রসমাজের মনমানসিকতার অনেকটাই আমি অনুধাবন করতে সক্ষম। জাপানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে সাত শতাধিক। এর মধ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যার দিক থেকে কম হলেও শিক্ষার মানের দিক থেকে অনেকটাই অগ্রগণ্য হিসেবে বিবেচিত; যদিও অল্প কিছুসংখ্যক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও সেই তালিকায় নিজেদের জায়গা করে নিতে পেরেছে।

জাপানের প্রধান যে গোটা পাঁচেক রাজনৈতিক দল দেশের রাজনীতিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে, এর কোনোটারই নেই সরাসরি কোনো ছাত্র সংগঠন। ছাত্রজীবন যেহেতু হচ্ছে নিজেকে গড়ে নেওয়ার এবং দেশ ও বিশ্বকে বুঝে উঠতে পারার সময়, ফলে মূল্যবান সেই সময়ের অযথা অপচয়ের পথে দেশের কোনো রাজনৈতিক দলই পা বাড়ায়নি, এমনকি কমিউনিস্ট পার্টিও নয়। ছাত্রদের মধ্যে কেউ যদি উৎসাহী হয়ে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলে যুক্ত হতে আগ্রহ বোধ করে থাকে, সে রকম অবস্থায় সেই সুযোগ তাদের সামনে সব সময় খোলা থাকছে। কেউ বাধা দিচ্ছে না ছাত্রদের রাজনীতিতে জড়িত হওয়ায়। তবে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছাত্র তার সেই মতাদর্শের রাজনীতিকে আগ বাড়িয়ে ক্যাম্পাসে নিয়ে আসছে না। জাপান কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান সভাপতি কাজুওশিই কিছুদিন আগে টোকিওর বিদেশি সাংবাদিকদের প্রেসক্লাবে দেওয়া এক ভাষণে বলেছিলেন, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকা অবস্থাতেই কমিউনিস্ট পার্টিতে তিনি যোগ দিয়েছিলেন।

যেহেতু রাজনীতি থাকছে ক্যাম্পাসের বাইরে, ফলে ছাত্র সংসদের নির্বাচন নিয়েও অধিকাংশ ছাত্রের নেই তেমন মাথাব্যথা। লেখাপড়ার প্রক্রিয়ায় ছাত্রদের চাওয়া-পাওয়ার দিকেই সংসদের দৃষ্টি নিবদ্ধ, টেন্ডারবাজি কিংবা নিয়োগসংক্রান্ত প্রভাব-তদবিরের দিকে নয়। রাজনৈতিক অবস্থানগত প্রশ্ন কখনো কখনো অবশ্য এসে পড়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার প্রক্রিয়ায়। তবে সেখানেও এটা দেখা যায় খুবই সীমিত আকারে।

জাপানে অবশ্য ছাত্রদের রাজনীতির প্রভাব থেকে এতটা মুক্ত থাকার প্রবণতা খুব বেশি দিনের নয়। ষাটের দশকে জাপান-মার্কিন মৈত্রী চুক্তির বিরোধিতায় ছাত্রসমাজের রাজপথে নেমে বিক্ষোভে শামিল হওয়ার স্মৃতি অনেকেরই মনে আছে। পরে সত্তরের দশকের শুরুতে ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনেও জাপানের ছাত্রসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। তবে আশির দশকের পর থেকে ভিন্ন যে ধারা জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে শুরু করে, এরই সূত্র ধরে সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রবণতায় ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক অনীহা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। তাই বলে ছাত্রসমাজ যে রাজনীতি সচেতন নয়, সে কথা বলা অবশ্যই অন্যায় হবে। শুরুতে উল্লেখ করা ইয়োকোহামা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টার-প্রসঙ্গ কিন্তু খুবই সচেতন রাজনৈতিক চেতনার প্রমাণ তুলে ধরে।

আমাদের বাংলাদেশেও মনে হয় এখন সময় হয়েছে ছাত্রসমাজকে রাজনীতি সচেতন করে তোলার, রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার তাদের হয়ে ওঠার নয়। আর এই দায়িত্ব সবচেয়ে ভালোভাবে পালন করতে যারা সক্ষম, তারা হলো শিক্ষক-সমাজ। তবে প্রশ্ন হলো, ছাত্ররাজনীতির প্রভাব-তদবিরের পথ ধরে শিক্ষক পদে নিয়োগ পাওয়া কেউ কি পারবেন সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে? প্রশ্নের উত্তর আমাদের অনেকটাই জানা আছে। ফলে জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট পেয়ে ক্ষমতাসীন হওয়া রাজনৈতিক দলের কাছ থেকেই বরং অনেক বেশি প্রত্যাশা এ ক্ষেত্রে আমরা করতে পারি।

টোকিও, মে ২০০৯

● মনজুরুল হক: শিক্ষক ও সাংবাদিক।